# জবাবদিহিমূলক সামাজিক পরিবেশই দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনের পূর্বশর্ত

–হিলসিংকি, ফিনল্যান্ড থেকে ড. মনজুর আলম

আপনি সম্প্রতি এমন একটা দিনও কি পাড়ি দিয়েছেন, যেদিন নিজে বা নিকট পরিচিত কেউ দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের শিকার হননি? কি ভয়ংকর ব্যাপার? মনে করতে পারছেন না! তাহলেই বুঝুন, কি সমাজে আমাদের বাস! এ নিয়ে আর যাই হউক– গর্ব করা যায় কি? গর্ব করি আর নাই করি তবুও বেঁচে আছি আর আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছি, "হে মহান পরওয়ারদেগার আমাদের তুমি রক্ষা কর। এই সন্ত্রাস ও দুর্নীতিময় সমাজে ভালো হয়ে বাঁচার তৌফিক দাও।" আমাদের ফরিয়াদ মহান আল্লাহর দরবারে কবে পৌঁছবে, কে জানে? যাহোক, আজকের বাস্তবতা হচ্ছে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসময় সমাজেই আমাদের বাঁচতে হচ্ছে। আসুন দেখা যাক এ সমাজে, এ কালে, এ সময়ে সাধারণ মানুষের জীবন কেমন যাচ্ছে ঃ

একজন কৃষক ফজরের নামাজ শেষ করেই মাঠের দিকে ধেয়ে যায়। মাঠে পানি দিতে হবে। পানি দেয়া জরুরী হয়ে গেছে। ধান বাঁচাতে হবে। তবেই না মুখে আহার জুটবে। কিন্তু একি! পাম্প কোথায়? কৃষকের মাথায় হাত। কে যেন পুরো পাম্পটাই তুলে নিয়ে গেছে। কৃষক কার কাছে নালিশ করবে? নালিশ করলেও বিচার পাবে কি?

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় রাস্তা হচ্ছে। একজন ভূমিহীন দিনমজুর লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে কাজের জায়গায় গিয়ে জানতে পারে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর মেম্বাররা মিলে পুরো গমই সদরে বিক্রি করে দিয়েছে। জানতে পারে, এ অপকর্মে খাদ্য বিভাগের রথি-মহারথি হতে শুরু করে

গোডাউনে কর্মরত কেরানীও নাকি জড়িত। ভূমিহীন দিনমজুরের মুখটা ম্লান হয়ে যায়। আজও উপোস দিতে হবে। আবার লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ক্ষুধার্ত পরিবারের সম্মুখীন হওয়ার কথা মনে হতেই ভূমিহীন অসহায় মানুষটার বুকটা ভেঙ্গে যায়। ঠিক তেমনি সার কিনতে গিয়ে অপর কৃষকের মাথায় হাত। মহাজন অনেক বাড়তি দাম চাইছে। সারের বস্তা তুলতে নাকি ঘুষ দিতে হয়েছে, তাই দাম চড়া। কৃষক ভাবে এ বাড়তি দাম সে কোথা থেকে দেবে। কে যে সাধু আর কে শয়তান সে সব চিন্তা করারও সময় নেই। তাছাড়া হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করবেই বা কার কাছে? সার ব্যবসায়ীরা তো আর কৃষক না। কৃষকের দুঃখ তারা বুঝবে কিভাবে? দেশের সরকারই কৃষকের দিকটা দেখার কথা। কিন্তু তাদের কত বড় বড় কাজ। রাজা মহারাজার সাথে দেন-দরবার। সাধারণ কৃষকের দুঃখ বুঝার ফুসরত কি তাঁদের আছে? কৃষক ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক হ্যাচারি করার জন্য লোনের আবেদন করেছে অনেক দিন। কোন খবর নেই! একদিন সদরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, লোন পেতে হলে খরচ করতে হবে। লোন পাওয়ার সাথে সাথেই নাকি ২০% টাকা কেটে রাখা হবে 'ফাইলমানি' হিসাবে। কৃষি ব্যাংকে লোন পেতে খরচা নাকি আরও বেশী। গ্রামেরই এক বিধবা, বেতের টুকরি বিক্রি করে সংসার চালায়। স্বামী শহরের এক বড়লোকের গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে বছর

পাঁচেক। সবাই বলেছে, গাড়ীআলারই নাকি দোষ কিন্তু বড়লোকের কিছুই হয়নি। দু'পয়সা ক্ষতিপূরণও বিধবা পায়নি! চারটি নাবালক সন্তানসহ সংসার চালাতে হয় টুকরি বিক্রির সামান্য আয় দিয়ে। যে দোকানের কোণায় সে প্রতি হাটে টুকরি বিক্রি করে সে দোকানদার ডবল ভাড়া চাচ্ছে! এলাকার মস্তানদের নাকি বেশী চাঁদা দিতে হবে। গ্রামেরই আরেক লোক সংসার চালায় থানা শহরে ফল বিক্রি করে। প্রতিদিন কাকডাকা সকালে আড়ত থেকে পাইকারী দামে ফল এনে রাস্তার পাশে খরিদদারের অপেক্ষা করে। সামান্য আয়। তারপরও হাজারো ঝামেলা। মস্তানদের পাশাপাশি প্রতিদিন থানাকেও সন্তুষ্ট রাখতে হয়। নতুবা ব্যবসা বন্ধ।

শহুরে দোকানদারদের ব্যবসা করা আর মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া একই কথা। পয়সা দিতে হয় দু'ভাবে। মাসিক ও দৈনিক। না, না, দোকান ভাড়া নয়। সেটা আলাদা। সমিতির লোকজন প্রতি মাসে চাঁদা নিয়ে যায়। সে টাকায় মাসওয়ারি মাস্তান ট্যাক্স, পুলিশ খাজনা ও বাড়তি ঝামেলা 'কভার' হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান বা পার্বণের চাঁদা আলাদা।

সেজন্য বাড়তি খাজনা। মাস্তানদের গ্রুপ পরিবর্তন হলেও ঝামেলা। বাড়তি ট্যাক্স, এর উপর আছে 'জানের' সমস্যা। কখন কোন ক্যাডার অভিমান করে ট্রিগারটা টিপে দেয়। 'পুলিশ খাজনা' আবার জান বাঁচানো 'কাভার' করে না। যারা ট্রিগার টেপে তাদের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশের রমরমা সম্পর্ক। তবুও অঘটন যদি ঘটেই যায়, তাহলে পুলিশ নাকি মহাখুশী। আয় বাড়বে! পুলিশেরও কি কম সমস্যা? দেশের সবাই পুলিশের উপর ক্ষেপা। পুলিশ ভাবে, 'উপরআলাদের দাবী মেটাতে মেটাতে জান শেষ। তার উপর কয়েক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে পুলিশ বাহিনীতে ঢুকতে যে ধার হয়েছে সেটা তো আছেই। যে বেতন, ইনফরমারের যে আয় তার চেয়েও কম। ইজ্জতের সওয়াল। সংসার, পরিবার সব ছেড়ে এ বেতনে কোন মানুষের চলে? তার উপর বড় সাহেবদের হাজারো বায়না। থানা চালানোর যে খরচ সেটা আসে কোথা থেকে? বড় খরচ থেকে শুরু করে কাগজ, কলম ইত্যাদি? ইনফরমারদের যে টাকা দেয়া হয় তার কতটুকু আসে উপর থেকে? ভাগ্যিস 'মাস্তান ভাইয়েরা' আছেন। তাদের সাহায্য না পেলে চাকরি তো চাকরি, থানাই থাকতো কিনা কে জানে?

'বড় সাহেবরা তো কালেক্ট করেন না। শুধু কালেকশান দেখেন। আর উপর থেকে ধাক্কা এলে দেন দাবড়ানি। পারসেনটেজ তো মাথা পর্যন্ত যায়। শুধু পাবলিককে দেখানোর জন্য অপারেশন আর অপারেশন। সত্যিই যদি এত অপারেশন হতো, বডি থাকে নাকি! যত্তসব। তবুও চাকরি বাঁচানোর জন্য ছোট ছোট মাছ কিছু ধরতেই হয়। মাস্তান ভাইয়েরা এতে মন খারাপ করেন না। অনেক সময়ে তারাই সবকিছু এ্যারেঞ্জ করে দেন। ছোট মাছ থেকে শুরু ভাঙ্গা হাতিয়ার পর্যন্ত। ছোট মাছরাও মাইন্ড করে না, জানে ক'দিন পরেই ছাড়া পেয়ে যাবে। উকিলদের সাথে মাস্তান ভাইদের বড্ড খাতির। দেশের বড় বড় উকিলরাইতো ভাইদের 'কেইস' লড়েন। মুখে বড় বড় কথা, সমিতির বড় বড় নেতা! মাস্তান ভাই যত বড়, উকিলও ধরে তত বড়। টাকার রং তখন ঠিক হইয়া যায়। পকেটে মাল পড়লে, সব বেটাই ঠাণ্ডা। সবাই ভাবে, পুলিশ খাচ্ছে। অন্যরা যে সব খেতে খেতে ফর্সা করে দিচ্ছে, সে খবর কে রাখে? শুধু পুলিশের দোষ! 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' কথাটা কি আর সাধে সাধে হয়েছে! দুনিয়াতে দুঃখীর পক্ষে কেউ নেই।

শহরে ছোট বা মাঝারি পদে কর্মরত চাকরিজীবীর অবস্থা ভাবুন। দিন চলে না। সংসারে ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। বাচ্চাকে স্কুলে দিতে হবে, ডোনেশন লাগবে। কেন? প্রশ্ন করলে ভর্তিই হবে না। চাকরিতে প্রমোশন বা ভালো পোস্টিং কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে না। লাইন দেয়ার দক্ষতা ও কড়ি ঢালার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। কখনো কখনো কোন্ দলের অনুসারী সেটাও ভালো কাজ দেয়। তবে আজকাল কড়ি না থাকলে শুধু লাইনে তেমন কাজ হচ্ছে না। ফাইল নিয়ে সঠিকভাব কাজ করলে বড় সাহেবের বিরাগভাজন হওয়া অত্যন্ত সহজ। কে যায় ঝামেলা করতে? তার চেয়ে নিজেরও কিছু থাক, বড় সাহেবেরও কিছু। ঝামেলা? বড় সাহেবের লাইন কড়া। নেতাদের রেগুলার খাজনা দিয়ে আসেন। কিচ্ছু হবে না। বরং নিয়ম মতো কাজ করলেই ঝামেলা। খাগড়াছড়ি বা বান্দরবানে বদলির সমূহ সম্ভাবনা। তার চেয়ে বড় সাহেবের মন জুগিয়ে চলা ঢের নিরাপদ।

টেন্ডারের সময় আর 'ঈদ' একই কথা। আমদানীর সময়। সবাই খুশী খুশী অন্য সব কাজের মুখে ঝাটা, টেন্ডার বলে কথা। বড় সাহেবরাই ঠিক করেন টেন্ডার নোটিশ পাবলিক না প্রাইভেট হবে। অবশ্য মন্ত্রী বাহাদুরের সম্মতি নিয়েই ঠিক করেন। চাকরির নিয়ম, মানতেই হয়। বড় বড় নেতাদের টেলিফোন আর মানুষের গমগমানিতে পুরো অফিস মনে হয় যেন বিয়ে বাড়ী। যাদের 'ধরিয়ে দিন' ছবিতে থানাগুলো সাজানো, তারাই কেমন হেলেদুলে রাজকীয়ভাবে বড় সাহেবের রুমে যেয়ে বসেন। খেদমত করতে করতে প্রাণান্ত হলেও বলার কিছু নেই। যাবার সময় হেসে হেসে বিদেশী সিগারেট হাতে ধরিয়ে দেয়। সিগারেট না খেলেও সাহস হয় না ফিরিয়ে দিতে। অপমানিত হয় কিনা সে ভয়ে। পুলিশরাও প্রশান্ত মনে তাদের সালাম ঠুকে। চাকরিজীবী ভাবে, 'টেন্ডার ব্যবস্থাটা উঠিয়ে দিলেই হয়। যাকে দেয়ার সেই তো পাচ্ছে। মিছেমিছি, এ ঝক্কি করতে গিয়ে ঝুটঝামেলা। খুনও হয়ে যাচ্ছে।' সে কথা কি বড় করে বলা যায়? লাশ হবার রাস্তা। তাছাড়া নিজের পকেটের অবস্থাও হবে গড়ের মাঠ। চুপ থাকাই ভালো।

শহরে চাকরি খুঁজে ফিরছে তেমন এক যুবকের অবস্থা দেখুন। কোন এক মেসে থেকে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছে। মেসের কাছাকাছি কয়েকটা বাড়ীতে অনেকটা খোলামেলাই চলছে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা। সবাই জানে। সরকারী সংস্থার লোকজন ও পুলিশ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সময়মত বখরা না পেলেই হামলা। অল্প কিছুদিনের মাথায় কয়েকটি খুন হয়ে গেলেও পুলিশের মাথাব্যথা নেই। খুনীদের সবাই চিনে। মাথা উঁচিয়েই চলে। এরকম পরিবেশে কার থাকতে ইচ্ছে করে? তবুও সস্তা বলেই থাকা। গ্রামে বাবা-মা বড় আশা করে আছে। ছেলে তাদের

অভাবের সংসার প্রাচুর্যে ভরিয়ে দেবে। অফিসে অফিসে যেতে যেতে এর মাঝে বেশকিছু দালালের সাথে পরিচয় হয়। অফিসের বেশকিছু কেরানীও এ কাজই করছে। অনেকে নাকি বড় সাহেবের দালাল। বলতেও লজ্জা নেই! বিরাট অংকের টাকার বিনিময়ে চাকরি পাইয়ে দেবে বলে নিশ্চিত আশ্বাস দেয়। এতো টাকা পাবে কোথায়? ভালো পড়ালেখা থাকলেও চাকরি হচ্ছে না। এমনকি ভালো ইন্টারভিউ দিলেও না। ক'টাকার চাকরির জন্য সে হন্যে হয়ে ঘুরছে আর তারই পাশে প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু লোক লক্ষ কোটি টাকা বানিয়ে নিচ্ছে। যুবক ভাবে পুলিশ এদের ধরছে না কেন? কেউ কিছু বলছে না কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় য়া এক ছাত্র, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগের সূত্র ধরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্র হিসেবে সে বরাবর ভালোই ছিল। পড়ালেখা শেষ করে কি করবে ভেবে না পেয়ে রাজনীতির সাথেই লেপ্টে যায়। আস্তে আস্তে পরিচয় হয় উপরআলার রাজনীতিবিদদের সাথে। রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের কেমন কদর্যভাবে ব্যবহার করছে, তা দেখে প্রথম প্রথম অবাক হলেও পরে সয়ে যায়। এটাই যেন নিয়ম! দলীয় ক্যাডারদের অনাচারের টাকা কোথা থেকে আসছে জেনে, প্রথম প্রথম চমকে উঠলেও একদিন সেও তাতে জড়িয়ে পড়ে। চাঁদাবাজি, টেন্ডার দখল হয়ে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দু-একবার পুলিশের সাথেও ঝামেলা হয়। ধরে নিয়ে যায়। রাখতে পারে না! 'লাল-টেলিফোনের' তেলেসমাতি। অনেক সময় পুলিশ অফিসার লজ্জিতভাবেই বলে, 'স্যার আপনারা যে 'ওনার' লোক আগে বলবেন তো।' শুনে বুকটা গর্বে ভরে যায়। এমন নেতারা আছে বলেই দেশটা চলছে।

রাজনীতির ঝামেলায় পড়ালেখা তেমন হয়ে উঠে না। তাতে কি? স্যাররাও এখন তোয়াজ করে। অনেকটা স্যারদের স্যারের মতো। নতুন ছাত্র ছাত্রীরাতো দেবতার মতো সম্মান করে। অনেকে পায়ে ধরে সালামও করে। হলে রুম পাওয়ার জন্য কতজন যে ধরনা দেয় তার হিসাব রাখা কঠিন। হলে রুম থাকলেও ধানমন্ডির বাসাতেই আড্ডা। ক্যাডাররা সেখানেই যোগাযোগ করে। লেনদেন সেখানেই চলে। অনেকেই আসে দেনদরবার করতে। কেউ বিরক্ত করলে নেতাদের মোবাইল নাম্বার পকেটে। বিদ্যুতের মতো কাজ হয়। নিমিষেই সমস্যার সমাধান। এজন্য অবশ্য সার্ভিস দিতে হয়। জুনিয়র আছে অনেক, অসুবিধে হয় না। ম্যানেজ হয়ে যায়।

শহরে বাস করা গৃহিণীর ঝামেলার কি শেষ আছে? দ্রব্যমূল্যের এ ঊর্ধ্বগতির বাজারে সংসার চালানোর কাছে মহাকাশে রকেট চালানো অনেক সহজ। প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কেন বাড়ছে, কেউ জানে না। দোকানীরা ইচ্ছেমত দাম হাঁকছে। নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। তেমন কোন দপ্তর, ক্রেতার স্বার্থ রক্ষার জন্য আছে কি? কে জানে? এমনিতেই প্রাণান্ত অবস্থা, তার উপর পাড়ার মাস্তানরা ভাড়া করা বাসায়ই প্রায় প্রতি মাসে চাঁদার জন্য আসে বিচিত্র সব আবদার নিয়ে। নেতার জন্মদিন পালনের জন্য বিরাট অংকের চাঁদা চাইলেও কিছু বলা যায় না। রাস্তায় আবার কি বিপদ করে, সে ভয়ে। কেউ কি নেই দেখার, গৃহবধূ ভাবেন। এইতো সেদিন, বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে বাসায় আসার পথে গলার সরু চেইনটা টেনে নিয়ে গেল। রিকশাওয়ালাটা দৌড়ে পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে বলতেই এমনভাবে তাকালো যেন বিরক্ত করছে। পাত্তাই দিল না!

অনেক কষ্টে জমানো টাকার সাথে সব গহনা বিক্রি করে এক টুকরো জমি অনেক দিন আগে নিলেও বাড়ী আর করা হয়ে উঠেনি। প্রতি বছর বাড়তি ভাড়া দিতেও ইচ্ছে করে না। সাহেবকে অনেক বলে-কয়ে হাউজ বিল্ডিং লোনের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছে। কোন খবর নেই। সাহেব খোঁজ-খবর নিয়ে এসে মুখ বুজে বসে রইলেন। কি হয়েছে? এমনভাবে চাইলেন, ভয় ধরে গেল। লোন তো লোন সাহেবের জন্যই চিন্তা হলো। জানা গেল, লোন পেতে হলে বছর দশেক দেরী হবে। আর শর্টকাট পথে গেলে ৩০%ই চলে যাবে পাইপলাইনে। পাইপলাইন কি, জিজ্ঞেস করতেই সাহেব মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। লোনের আশা ছেড়ে, দেশের জমি বিক্রি করে কোন রকমে থাকার জন্য একতালা বাড়ী করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্ল্যানারকে নিয়ে জায়গাটা দেখে আসেন। ক'দিন পরই বাসায় কলিং বেল বেজে উঠে। কিছু যুবক দেখা করতে আসে। ক্লাবের চাঁদা ছাড়া এলাকায় বাড়ী বানানো যাবে না, সোজাসাপটা কথা। এ চাঁদার কথা লোকমুখে শুনলেও যুবকদের অংক শুনে স্বামী-স্ত্রী দু-জনই দাঁড়ানো থেকে বসে পড়েন। জায়গাই কবে বেদখল হয়ে যায় সে চিন্তায় স্বামীর রাতে ঘুম হচ্ছে না। কিছুই করার নেই। এক নিকটাত্মীয় যিনি পুলিশের মাঝারি ধাপের কর্মকর্তা, খোঁজখবর নিয়ে উপদেশ দিলেন আপোষ করে নেয়ার জন্য। পাড়ার মাস্তানদের সাথে নাকি বড় জাঁদরেল গডফাদার জড়িত। পুলিশ হলেও তাঁর ক্ষমতায় কুলাবে না কিছু করার! সে বাড়ী আজও হয়নি।

একবার ভাবুন স্কুল বা কলেজ পড় য়া মেয়ের কথা। স্কুল বা কলেজে যাওয়া-আসার পথে পাড়ার বখাটেরা শত সহস্র

যন্ত্রণা করলেও কিছু বলা যাবে না। আপনি বাবা বা মা, কত আর সহ্য হয়। একদিন কিছু বললেন কি মরলেন। বড় পান্ডাদের সাথে নিয়ে তারা ধমক দেবে, 'মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবো'। পুলিশের কাছে নালিশ করলে দাঁত কেলিয়ে বলবে, 'এখনো তো তুলে নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেলে জানাবেন। দেখছেন না ব্যস্ত আছি'। পাড়ার অভিভাবকরাও আজকাল কিছু বলতে সাহস করেন না। কিছু বলে মাস্তানদের বিরাগভাজন হওয়ার রিস্ক নিয়ে পস্তাতে হবে সে ভয়ে। আর আপনি দেখবেন, পাড়ার মাস্তান আর পুলিশের লোকজন মোড়ের দোকানে চা খেতে খেতে আপনাকে দেখে হাসছে। ধরণী দ্বিখণ্ডিত হউক, আপনি তাতে ডুবে যেতে চান। আপনার সন্তানকে নিরাপত্তা দিতে আপনি অক্ষম। আপনি অসহায়। তথাপি, আপনি বেঁচে আছেন, এমন সমাজেই আপনি বেঁচে আছেন।

উপরে বর্ণিত 'এপিসোড'গুলো কল্পিত। আমি, আমরা সবাই কত না খুশী হতাম যদি বর্ণনাগুলো, কল্পনার ফানুস দিয়ে গড়া অবাস্তব অবস্থার চিত্রায়ন হতো। কিন্তু ভেবে দেখুন, চারপাশের মানুষদের দিকে তাকিয়ে দেখুন– এটা কি সুস্থ পরিবেশে? এমনতর সমাজ, যেখানে মাস্টারমশায় নকল সরবরাহ করেন, পুলিশ ভাই অপরাধীদের কাছে থেকে মাসোহারা নেন, ব্যাংক ম্যানেজার ও কর্মচারীরা গ্রাহকদের কাছ হতে টাকা খান, দুর্নীতি দমন অফিসার দুর্নীতিবাজদের সাথে উঠাবসা ও দুর্নীতি করেন, রাজনীতিবিদরা জনগণকে অনায়াসে বিক্রি করেন, অপরাধী ক্যাডারদের ভয়ে সাধারণ নাগরিক মুখ নিচু করে চলেন, আইনভঙ্গকারীরা আইন প্রণয়ন করেন, সরকারী কর্মচারীরা জনগণকে নীলকুঠির প্রজা ভাবেন, কালো টাকার ধনীরা সমাজপতি হন, মাস্তানরা সমাজের হর্তাকর্তা, বিধাতা হন। এমনতর উদাহরণ যে কতো, তা আপনিই ভালো জানেন। উদাহরণ দিয়ে পত্রিকার পাতা শেষ হবে কিন্তু উদাহরণ কি ফুরাবে?

এর সমাধান কি? এত এত উদাহরণের কারণ নিশ্চয়ই একটি মাত্র নয় এবং একটি মাত্র কর্মে তার সমাধানও আশা করাও অবান্তর। তবে, শুরু তো করতে হবে। কোথায়? দেশে অনেকে পণ্ডিতজন আছেন, তারা এ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো পথের হদিস দিতে পারবেন। সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন কেমন করে এ পতিত সমাজকে টেনে তোলা যাবে। দেশ ও জাতি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এ পথ সম্পর্কে ভাবতে যেয়ে ছোটবেলায় শিখা, 'অন্যায়, তা যেই করুক না কেন সেটা অন্যায়ই' এবং 'অন্যায়ের প্রতিফলন পেতেই হয়', কথা দুটো কেন যেন বার বার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, আমাদের চরম সমস্যার এ বাক্য দুটোর মাঝেই যেন লুকিয়ে আছে!

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে, প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ। আমাদের দেশের সংবিধানও সে কথাই বলে। তাই যে কোন সরকার গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে, প্রতিটি নাগরিকের আইনগত সমমর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তাই করবে। এবং সেটা করার জন্যই সরকার। সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে সংবিধান সমুন্নত রাখা এবং সংবিধানে বর্ণিত জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যই সরকারের দায়িত্ব আইনের সম প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। দোষী, যত ধনীই হউক না কেন, যত বড় বংশের সন্তান বা যত বড় নেতাই হন না কেন, দোষ করলে দোষী হবেন এবং দেশের আইন অনুযায়ী সাজা পাবেন। সাজা পাওয়া নিশ্চিত করার জন্যই জনগণ কিছু লোক নির্বাচিত করে সমষ্টিগত সামাজিক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। প্রদেয় ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যই সরকার।

তাই দেশের সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন করার প্রধান শর্ত হচ্ছে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি সে যেই করুক না কেন, যে দলেরই বা যত বড় পয়সাওয়ালাই হউক না কেন, যত বড় নেতা বা গডফাদারই হন না কেন শাস্তি পেতে হবে। সরকার সে শাস্তি পাওয়া নিশ্চিত করবে। সন্ত্রাসী বা দুর্নীতিবাজদের জনগণ ফাঁসি দিতে পারে না কারণ তাতে সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হয়।

জনগণ সে দায়িত্ব সরকারকে দিয়েছে। কিন্তু সরকারের চেয়ে সন্ত্রাসকারীরা বা দুর্নীতিপরায়ণকারীরা যদি অধিক শক্তিশালী বা অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায় তবে জনগণের মনে প্রশ্ন জাগবে, সরকারের কি প্রয়োজন?

সমাজে অন্যায়ের বিচার যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলেই সন্ত্রাসকারী বা দুর্নীতিবাজরা সন্ত্রাস বা দুর্নীতি করতে চাইবে না। পাগলও যেখানে ঠাণ্ডা-গরম বুঝে, সেখানে সন্ত্রাসীরা 'জাতে মাতাল হলেও তাল তারা ঠিকই বুঝে নেবে'। বুঝতে বাধ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে অনেক সন্ত্রাসী, সরকার পরিবর্তন হলে বিদেশে পালিয়ে যায়। অনেকে ইউরোপ, আমেরিকা, সিংগাপুর, নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ায়ও পাড়ি দেয়। দেশে যার ভয়ে বাঘ ও ভেড়া এক ঘাটে পানি খায়। মানুষের বুক কবুতরের বাচ্চার মতো কাঁপে কিংবা যাদের গায়ে ফুলের টোকা দেয়া অকল্পনীয় মনে হয়। সেই একই সন্ত্রাসী বিদেশে আসার পর মুহূর্তেই কেমন ভদ্র হয়ে যায়– তা জুয়েল আইচের যাদুর চেয়েও অভাবনীয় মনে হয়। অন্যায় করলে যে শাস্তি পেতে হবে, দেশ কাঁপানো সন্ত্রাসী কি সহজে বুঝে যায় সেটা অবাক হওয়ার মতো প্রবাসে অনেক বাংলাদেশী বাস করছেন। তাঁরা এর সত্যতা ভালো জানেন।

এ পরিবর্তন যে হঠাৎ মানসিক পরিবর্তন বা যাদু-বিদ্যার ফসল নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে সকল দেশে অন্যায় করলে, ছোট হউক আর বড়ই হউক তার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে সরকার আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। সে কারণেই সন্ত্রাসী নেমেই বুঝতে পারে, এ সমাজে অন্যায় করলে শাস্তি পেতে হবে। ধরা পড়লে কোন সম্পর্ক, দল বা কড়ি সাহায্যে আসবে না। সন্ত্রাসী গডফাদার তখন 'মিউ বিড়াল' হয়েই নতুন সমাজে বাস করে।

তাই মনে হয় 'অন্যায় যেই করুক না কেন অন্যায় অন্যায়ই', এবং 'অন্যায়ের প্রতিফলন পেতেই হয়' পুরোনো কথা দুটির বাস্তব প্রয়োগ যদি নিশ্চিত করা যায় তবে নিশ্চয়ই আমাদের দেশ থেকেও দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমন সম্ভব। আপনার কি মত? **লেখক ঃ শিক্ষক, কলামিস্ট**

## কিছু ফল মিষ্টি, আবার কিছু ফল টক যে কারণে

ফলের মধ্যে সাধারণ ফ্রুকটোজ (শর্করা বা চিনি), কিছু এসিড, খনিজ, ভিটামিন, শ্বেতসার, প্রোটিন ও সেলুলোজ থাকে। উক্ত যৌগসমূহের উপস্থিতির ওপর ফলে স্বাদ নির্ভর করে এবং অনুপাতের তারতম্যের কারণে একেক ফলের স্বাদ একেক রকম হয়। ফলের মধ্যে ফ্রুকটোজ বেশী থাকলে তার স্বাদ মিষ্টি। আর এসিড বেশী থাকলে তার স্বাদ টক। কমলালেবুতে প্রায় সমপরিমাণ ফ্রুকটোস ও এসিড থাকার জন্য কমলালেবু খেতে মিষ্টি ও টক। সাধারণ কাঁচা অবস্থায় এসিড বেশী থাকে কিন্তু পেকে গেলে এসিডের পরিমাণ কমে যায়। অপর পক্ষে চিনির পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই কাঁচা আম টক হলেও পাকা আম বেশী মিষ্টি। তাছাড়া ফল পাকলে রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে ফলে শ্বেতসার ক্রমশ ফ্রুকটোস (চিনি)-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ ফল মিষ্টতা পায়, যেমন- কলা ❑ আবদুল মালেক জাবির

## কতিপয় অভাবজনিত রোগের কারণ

| রোগের নাম | কারণ |
|---|---|
| গলগন্ড | আয়োডন |
| স্কার্ভি | ভিটামিন-সি |
| রাতকানা | ভিটামিন-এ |
| বেরিবেরি | ভিটামিন-বি১ |
| পেলেগ্রা | ভিটামিন-বি৩ |
| ডায়াবেটিস | ইনসুলিন |
| রিকেট | ভিটামিন-ডি |
| টিটেনি | ক্যালসিয়াম |
| দাঁতের ক্ষয়রোগ | ফ্লুরাইড |
| প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস | ভিটামিন-ই |
| অধিক রক্তক্ষরণ | বিটামিন-কে |

❑ **জাকির হোসেন**

## উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন 'সি'

যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ (মডারেট) থাকে তবে এন্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগের চেয়ে অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' দরকার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ৫০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' সিস্টোলিক প্রেসার ১৩ পয়েন্ট এবং ডায়াস্টেলিক প্রেসার ৮ পয়েন্ট কমাতে পারে, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধের প্রায় সমান। আর ভিটামিন 'সি' তো সামান্য দামে সহজলভ্য ফল, শাক সবজি থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং আমলকি, পেয়ারা, জাম, মুসাম্বি, কাঁচা আম, সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি, বাঁধাকপি, ফ্রেঞ্চবিন ইত্যাদির কিছু না কিছু প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যুক্ত করুন। সিজনালি যখন যেটা পাওয়া যায়। তবে যদি ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট খেতে চান অবশ্যই ডাক্তারের পরমার্শ নিয়ে তবেই খাবেন। ❑ **নবীন কুমার বণিক**

## একদিনে ৪৬ কোটি সিগারেট বিক্রি!

সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ১৬,০০০ টন তামাক উৎপাদন হয়, যা দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ দিনে গড়ে দুটো করে সিগারেট টানতে পারবে। দুনিয়ার ধূমপায়ীরা সারাদিনে ১০ টন সিগারেট পোড়ায়। সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপাদনকারী দেশ (ক) চীন ১৮% (খ) যুক্তরাষ্ট্র ১৬% (গ) ভারত ৭% (ঘ) ব্রাজিল ৬% (ঙ) রাশিয়া ৫% (চ) তুরস্ক ৪%।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান যে পরিমাণ সিগারেট উৎপাদন করে তাতে তাদের প্রত্যেক নাগরিক দিনে ৮টি করে সিগার নিতে পারে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড 'মার্লবোরো'। এর বিক্রি দিনে ৪৬০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৬ কোটি স্টিক বা শলাকা। দিনে পৃথিবীতে মোট সিগারেট উৎপাদন হয় ৯০০০ মিলিয়ন (৯০০ কোটি) স্টিক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কিছুদিন পূর্বে এক ভাষ্যে বলে যে, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ তামাক গ্রহণের জন্য প্রতি বছর ১ কোটি লোকের মৃত্যু হবে। এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশেই মারা যাবে ৭০ লাখ মানুষ।

❑ **মোহাম্মদ ওমর ফারুক**

## এবার কি ইরাকের পালা? ঃ সাহাদত হোসেন খান

ইরাকে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে। যে অভিযোগে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে ঠিক একই অভিযোগ খাড়া করা হচ্ছে ইরানের বিরুদ্ধেও। মার্কিন প্রশাসন অভিযোগ করছে যে, ইরান নাকি পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরী করছে। এবং সন্ত্রাসবাদে মদদ যোগাচ্ছে। সউদী আরবে ১২ মে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হচ্ছে আল-কায়েদাকে। বলা হচ্ছে যে আল-কায়েদার একটি সেল তেহরানে অবস্থান করছে এবং তারাই এ হামলা করেছে। আরো বলা হচ্ছে যে, লাদেনের প্রাক্তন বডি গার্ড সাইফ আর আদেল আল-কায়েদার সামরিক প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন এবং ইরানী রেভুলিউশনারি গার্ড তাকে সহায়তা দিচ্ছে। মার্কিন অভিযোগগুলো গুরুতর এবং এর পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ। আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং একটি অন্যায় যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের পতন ঘটানো হয়। এ অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস কম-বেশী সবাই জানে। এজন্য ইরান যথারীতি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু ওয়াশিংটন ইরানের এ অস্বীকৃতি উড়িয়ে দিয়ে দেশটির সঙ্গে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে এবং হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যে তিনটি দেশকে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করছে ইরান হচ্ছে তাদের একটি। গত বছরের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং অভিযোগ করেন যে, এসব দেশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর চেষ্টা করছে যা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বে সিআইএ'র এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী

করে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সিআইএর এ রিপোর্টে চারদিকে তোলপাড় শুরু

হয়। কারো কারো চোখ কপালে ওঠে। অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধকালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভীতির চোখে দেখেছে। এখনো যদি তাকে কোন দেশকে ভয় করতে হয় তাহলে সেসব দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া ও চীনই হবে উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান, ইরান,

সিরিয়া, সুদান, উত্তর কোরিয়া অথবা লিবিয়ার মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হিসেবে গণ্য করা খুবই রহস্যময়। সামরিক সামর্থ্য, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার বিচারে এসব দেশ গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হওয়া তো দূরে থাক, যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যেরও সমান নয়। আর সমান হলেই বা কি! শক্তিতে সমান সমান হলেই যে একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের যুদ্ধ হবে তাও মেনে নেয়া যায় না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোর সিংহভাগই হয়েছে এক প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আরেক প্রতিবেশীর। তবে মতাদর্শগত প্রশ্নে যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়নি তা নয়। ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপ এবং কোরীয় যুদ্ধের পেছনে কম বেশী মতাদর্শের একটি তাগিদ ছিলই। তাছাড়া ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধরের প্রশ্নও ছিল। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মতাদর্শগত প্রয়োজনে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার কোন যুক্তি আছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না। কিন্তু তারপরও সংকট দেখা দিচ্ছে এবং বিশ্বশান্তি বিপন্ন হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটাঘাঁটি না করলে একথা কেউ বলতো না যে, ইরান, ইরাক অথবা উত্তর কোরিয়া কোন সমস্যা। এসব দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোন ভূখণ্ডগত বিরোধ নেই। এরা তার প্রতিবেশীও নয়। আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও একথা কেউ বলবে না যে, উত্তর কোরিয়া অথবা ইরান বিনা কারণে যুক্তরাষ্ট্রে হামলা করতে যাবে। উত্তর কোরিয়া কথা মেনে নিলেও ইরানের কথা মেনে নেয়া যায় না। ইরাক হুমকি হলে বড়জোর সে তার প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হতে পারে। দেশটির হাতে বর্তমানে যেসব ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে সেগুলোর পাল্লা সাড়ে ১৩শ' কিলোমিটারের বেশী নয়। তাতে কি? মাঝারি অথবা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থাকার অর্থ তো এই নয় যে, ইরান এসব ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে যাকে খুশি তাকে আঘাত করে বসবেই। দেশটির এমন কোন রেকর্ডও নেই। ইরাকের সঙ্গে ইরানের ৮ বছর যুদ্ধ হলেও এ ইসলামী দেশটিকে কোনভাবেই যুদ্ধবাজ বলা যায় না। মার্কিন প্ররোচনায় যুদ্ধ শুরু না হলে ইরাক ও ইরান উভয়ে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো না। ইরাক ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করছে এবং রাশিয়ার সহযোগিতায় পারমাণবিক রিএ্যাক্টর স্থাপনের চেষ্টা করছে, একথা সত্য, পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারলে সে পারবে না কেন? অন্যান্য দেশের মত ইরানেরও আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। তবে কি যুক্তরাষ্ট্র চায় যে, প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র তৈরী না করে ইরান বহিঃশক্তির আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুক? ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী যেমন উদ্বেগের কারণ তেমনি যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশগুলোর অগণিত ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রও ইরানসহ প্রায় প্রতিটি দেশের জন্য সমান উদ্বেগের কারণ। বিচারের মানদণ্ড কখনো দু'রকমের হতে পারে না। ইরানের সন্দেহভাজন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রও ইরানের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তেহরানকে দোষারোপ করছে। কিন্তু সে নিজে কি দোষমুক্ত? একথা কে না জানে যে, আল-কায়েদা মার্কিন সিআইএর সৃষ্টি? আল-কায়েদা যতদিন সমাজতন্ত্র ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতো ততদিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু যেই এ সংগঠনটি তার স্বার্থের বিরোধিতা করতে শুরু করেছে তখনি সে শত্রু হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের যেমন নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে তেমনি অন্যান্যদেরও নিজস্ব সুবিধা- অসুবিধা থাকতে পারে। কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তাগণ তা বরদাস্ত করতে রাজি নন। তারা যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করবে তখন অন্যদেরও একই কাজ করতে হবে। ঘটনাক্রমে তারা কারো বিরোধিতা করতে শুরু করলে অন্যান্য দেশকেও তাকে অনুসরণ করতে হবে। এই হচ্ছে মার্কিন মানসিকতা। তাই যদি হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবী করে কিভাবে? গণতন্ত্র কখনো অন্যের মতামতের ওপর হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। এটা এমন এক দর্শন যেখানে প্রত্যেকের নিজ নিজ মতামত থাকবে এবং একজন আরেকজনের মত প্রকাশে বাধা দেবে না। গণতন্ত্রের এ অনুশীলন শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রযোজ্য। ইরান একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে তার কর্তব্য স্থির করবে। কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি ভালো নয়– সেটা তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের অধিকার খর্ব না করবে ততক্ষণ তার অধিকারে বাধা দেয়া সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আল-কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য ইরানকে জবাবদিহি করতে হলে ইরাকে অবস্থানরত ইরানবিরোধী মুজাহিদীন খালক বা পিপল্‌স

মুজাহিদীনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যও ওয়াশিংটনকেও জবাবদিহি করতে হবে। সউদী আরবে বোমা হামলার পেছনে ইরানের হাত থেকে থাকলে ১৯৮১ সালের জুনে তেহরানে ইসলামী বিপ্লবী রক্ষীদলের সদর দপ্তরে বোমা হামলায় কার হাত ছিল তাও খুঁজে বের করতে হবে। তেহরানে এ বোমা হামলায় ইসলামী বিপ্লবী রক্ষীদলের প্রধান আয়াতুল্লাহ বেহেশতী, প্রধান বিচারপতি ও ৪ জন কেবিনেট মন্ত্রীসহ ৭০ জন শীর্ষস্থানীয় ইরানী কর্মকর্তা নিহত হন।

যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে যুদ্ধ করতে এসে দেখতে পাচ্ছে যে, এ যুদ্ধে সে লাভবান হচ্ছে যতটুকু প্রতিবেশী ইরান লাভবান হচ্ছে এর চেয়ে বেশী। ইরাকে শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এ দেশটি এ যাবৎ শাসন করেছে সংখ্যালঘু সুন্নীরাই। কিন্তু ইরাকে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে শিয়ারা জেগে উঠেছে। ইরানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বদর ব্রিগেড ইরাকে ঢুকছে। তাদের সঙ্গে ইরানবিরোধী মুজাহিদীন খালক গ্রুপের কোথাও সংঘর্ষ শুরু হয়। মার্কিন সৈন্যরাও মুজাহিদীন খালকের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। এ সময় তাদের হুঁশ হয়। তারা বুঝতে পারে যে, ইরাকে সাদ্দাম বিরোধী গোষ্ঠী ও দল উপদলের সহায়তায় যেভাবে বাগদাদের পতন ঘটানো সম্ভব হয়েছে, ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য বিরোধেও মুজাহিদীন খালক গ্রুপের মত ইরানী বিরোধী গ্রুপগুলোর সহায়তার প্রয়োজন হবে। এ চিন্তা থেকে মার্কিন সৈন্যরা এ গ্রুপের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তালিকা থেকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে মুজাহিদীন খালক গ্রুপের নাম কেটে দেয়া হয়। ইরাকে যুদ্ধ করতে এসে মার্কিন সৈন্যরা পড়েছে উভয় সংকটে। সংখ্যালঘু সুন্নীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের অর্থ সাদ্দামের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব। আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের মানে দাঁড়ায় ইরানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। অথচ সাদ্দাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান উভয়েই আমেরিকার কাছে পরিত্যাজ্য। এ জগাখিচুড়ির মধ্যেও মার্কিন প্রশাসন ইরাকে টিকে থাকার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদেরই বেশী আস্কারা দিচ্ছে। এতে শিয়ারা ভেতরে ভেতরে খুবই পুলকিত হচ্ছে। ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়ারা দেখতে পাচ্ছে যে, আজ হোক কাল হোক নির্বাচন হলে তাদেরই বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ইতোমধ্যেই ইরান থেকে ফিরে এসেছেন ইরাকের সর্বোচ্চ শিয়া ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ হাকিম আল বাকির। আয়াতুল্লাহ বাকির ইরাকে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। নাজাফে তিনি তার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইতোমধ্যেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, নাজাফকে ইরাকের কোম নগরীতে পরিণত করা হবে। ইরাকে সাদ্দাম সরকারের পতনে সেদেশে ইরানী ধাঁচের একটি ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ার সকল অনুকূল শর্ত তৈরী হয়েছে। এতে মার্কিনীদের মাথা গরম হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, ইরাকে ইরানী স্টাইলের ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে না। তিনি ইরাকে শিয়াদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার জন্য ইরানকে দায়ী করেছেন এবং বলেছেন, ইরানী গুপ্তচরেরা নাকি ইরাকের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

ইরাকে হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনেকেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পেন্টাগনের যুদ্ধবাজরা এ নিষেধ কানে তুলেননি। তারা ভেবেছিলেন গায়ের জোরে তারা সব করে ফেলবেন। কিন্তু তা পারছেন না। ইরাকে শক্তিপ্রয়োগ করতে না করতেই ইরানেও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে, ইরানের পতন ঘটানো সম্ভব না হলে ইরাকে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার অনিবার্য দাবি দাবিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ইরাকে ইঙ্গ মার্কিন আগ্রাসনের ফলাফল মোটেও দখলদার শক্তির অনুকূলে যাচ্ছে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া প্রধান এ দেশে ইরাকী স্টাইলের ইসলামী সরকার কায়েম হলে পরিস্থিতি দাঁড়াবে এই যে, ইরান থেকে লেবানন পর্যন্ত একটি অখণ্ড শিয়া শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠবে। লেবাননে ইরানপন্থী হিজবুল্লাহ গেরিলারা দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছে। সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন আজাদ পরিবার হচ্ছে শিয়া। এ হচ্ছে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক বাস্তবতা। এ বাস্তবতা দেখে আমেরিকা ঘাবড়ে গেছে। তবে ইরানও যে বিচলিত হচ্ছে না তা নয়। চারদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে ঘিরে ফেলেছে। মার্কিন সৈন্যরা তার দোরগোড়ায়। ইরানের পরিণতি ইরাকের মত হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইরান চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ভাবছে যা হবার ইরাকের হবে, তাতে তার কি। কিন্তু যম তাকেও ছাড়বে না। ইরান ও ইরাক দুটি মুসলিম দেশ। উপসাগরীয় যুদ্ধে অথবা এ যুদ্ধে আগ্রাসী মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে আজ এ অঞ্চলের ইতিহাস হত ভিন্ন। ইরাকী মুসলমানদের এ দুভার্গ্য বরণ করতে হত না এবং ইরানী মুসলমানদের জন্যও একই পরিণতি অপেক্ষা করত না। ইরাকে ইঙ্গ মার্কিন হামলায় সবচেয়ে লাভবান হয়েছে ইসরাইল। তবে এতেও ইসরাইলের স্বার্থ পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। সিরিয়া ও ইরান হচ্ছে এ অঞ্চলে ইহুদীবাদী সম্প্রসারণের পথে মস্তবড় বাধা। ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দখলদার শক্তি এ দুটি দেশের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্র পলাতক ইরাকী নেতৃবৃন্দকে আশ্রয় না দেয়ার জন্য সিরিয়াকে হুঁশিয়ার করে দেয়। মার্কিন মনোভাব বুঝতে পেরে সিরিয়া তৎক্ষণাৎ ইরাকের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দেয় এবং কয়েকজন পলাতক ইরাকী নেতাকে বের করে দেয়। সিরিয়ার এ উদ্যোগে ওয়াশিংটন সন্তুষ্ট হয় এবং গত মাসের প্রথমার্ধে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল দামেস্ক সফরে আসেন। তার সফরের মধ্য দিয়ে সিরিয়ার সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে ইরানের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক ক্রমেই বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, এ অঞ্চলে ইসরাইলের জন্য সিরিয়া যতটুকু বিপজ্জনক তার চেয়ে বেশী বিপজ্জনক হচ্ছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ ফিলিস্তিন ইসরাইল শান্তি চুক্তিকে স্বীকৃতি দিলেও ইরান এ চুক্তি মেনে নেয়নি। এজন্যই আমেরিকা ও ইসরাইল ইরানের প্রতি এত ক্ষ্যাপা। ইসরাইল প্রায়ই অভিযোগ করে যে, তেহরান নাকি ফিলিস্তিনীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহ করে। গত বছরের জানুয়ারীতে গাজা উপকূলে ইসরাইলী নৌবাহিনী একটি ফিলিস্তিনী নৌযান আটক করে এবং দাবি করে যে, এতে নাকি ফিলিস্তিনীদের জন্য ইরানী অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ওয়াশিংটনও ইসরাইলের সঙ্গে সুর মেলায়। কিন্তু ইরান চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রমাণ দাবী করে। ইসরাইল নাছোড়বান্দা। ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতকে অভিযুক্ত করা হয় এবং বলা হয় যে, ইরান থেকে অস্ত্র আমদানীর সঙ্গে জড়িত ফিলিস্তিনী কর্মকর্তাদের ইসরাইলের কাছে হস্তান্তর করা না হলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। উপায়ান্তর না দেখে আরাফাত দু'জন ফিলিস্তিনী কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকেই ইরানীরা একথা ভালোভাবেই জানে যে, বাঁচতে হলে তাদেরকে আমেরিকার সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। এ লক্ষ্যে তারা জাতীয় নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সাড়ে ৬ লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি ইরানীর জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পারস্য উপসাগরীয় বন্দর নগরী বুশারে পারমাণবিক প্রকল্পে দিন রাত কাজ চলছে। ইরান ইতোমধ্যেই শাহাব-১, ২ ও ৩ এবং ফাতাহ নামে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছে। এছাড়া, চীন ও উত্তর কোরিয়া থেকেও ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাশিয়ার সঙ্গে ১৭ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করা হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় রাশিয়া ইরানে আরো দুটি পারমাণবিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দেবে। ইরানের এসব প্রস্তুতি ওয়াশিংটনকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। মার্কিন কৌশলবিদগণ হিসাব করে দেখতে পেয়েছেন যে, এ মুহূর্তে ইরানে আঘাত করা সম্ভব না হলে আর পারা যাবে না। ২/১ বছরের মধ্যেই ইরান পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে যাবে। তখন তাকে আর স্পর্শ করা যাবে না। ইরান শক্তিশালী হলে লেবাননের হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া ও সিরিয়াও শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যাবে। সিরিয়া দুর্বল বলেই ইসরাইল গোলান মালভূমি ছেড়ে দিতে টালবাহানা করছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য ফিরে এলে ইসরাইলকে অবশ্যই গোলান ছাড়তে হবে। ২০০০ সালের মে মাসে ইসরাইল লেবানন ত্যাগ করেছে। তবে এখনো সে লেবাননের সেবা (SEABA) নামে একটি এলাকা দখল করে রেখেছে। এখান থেকে ইসরাইলী সৈন্যদের হটাতে হিযবুল্লাহ গেরিলারা প্রাণপণ লড়াই করছে। ইরানই হচ্ছে হিযবুল্লাহ গেরিলাদের শক্তির উৎস। আগামী দিনে ইরান একটি পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে সেবা থেকে ইসরাইলী সৈন্যদের হটাতে হিযবুল্লাহ গেরিলাদের মোটেও কষ্ট হবে না। এজন্যই ইসরাইল ভয় পাচ্ছে। তার এ ভয় দূর করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের মত ইরান দখল করার জন্য পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।